জুলেখার কাছে মনে হয় তার বাবার বিশাল বাড়ীও মিজানের বাড়ীর তুলনায় ক্ষুদ্র ছিল। মিজানের সাথে তার যখন বিয়ে হয়েছিল বছর খানেক আগে, তখন সে শুনেছিল কানাডাতে মিজান আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, কিছু সহায় সম্পত্তিও আছে, কিন্তু বোঝে নি লোকটা এতো জায়গা জমি নিয়ে আর এমন রাজ প্রাসাদের মত একটা বাড়ী নিয়ে বসবাস করে। এখানকার বাসাবাড়ীগুলো অবশ্য তার দেশের মত না। নীচ তলায় সব খোলা মেলা, রান্না ঘর, লিভিংরুম, ফ্যামিলিরুম, ডাইনিং রুম, স্টোরেজ রুম আর উপরে আধা ডজন বিরাট সাইজের শোবার ঘর। তাদের মাত্র দু'জনার সংসারের জন্য অত্যন্ত বিশাল মনে হয়। একা একা তার বাসার মধ্যে হাঁটলে একটু অস্বস্তিই লাগে মাঝে মাঝে। নিরালা ভালো, কিন্তু এ যেন বেশী নিরালা।

পেছনের অঙ্গনে নেমে প্যাঁচপ্যাঁচে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে বাড়ীটার এক পাশে চলে এলো জুলেখা। বাড়ীটা পশ্চিম মুখী। ফলে সামনে রোদ আসে বিকালে, আর পেছনে রোদ আসে সকালে। অধিকাংশ ফুল গাছের রোদ লাগে অন্তত আধা দিন কিংবা আরও বেশী, জানে সে। বাড়ীর দক্ষিন পাশটাতে বেশ বড় সড় জায়গা নিয়ে বাগান করা হয়েছে। এখানটাতে প্রায় সারাদিন রোদ পড়ে। যত্ন করে চারকোনা বাগান বানিয়ে সেখানে নানান জাতের পেরেনিয়াল উদ্ভিত লাগানো হয়েছিল। বসন্তের উষ্ণতা আসার সাথে সাথে হঠাৎ করেই যেন টগবগিয়ে মাথা উঁচিয়ে আকাশমুখী ছুটতে শুরু করেছে নতুন গজিয়ে ওঠা গাছগুলো। মাত্র ক'দিন আগেই বিষন্ন হয়ে থাকা প্রকৃতি আচমকা যেন কি এক নতুন বলে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। জুলেখা মুগ্ধ হয়ে গেছে এসব দেখে। পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে সে সযত্নে ছোট ছোট চারাগুলোর শরীরে হাত বোলায়। এই সব গাছ তার পরিচিত নয়। কিন্তু বইয়ে সে পড়েছে তারা শীতের সময় চুপটি মেরে পড়ে থাকে মাটির নীচে। গরম এলেই লাফিয়ে উঠে আসে। কোন গাছে কি ধরণের ফুল হয় দেখবার জন্য সে খুব উদগ্রীব হয়ে আছে।

বাগানটা পেরিয়ে আরও ফুট ত্রিশেক গেলে মাঝারী আকারের একটা শেড। ছোটখাট একটা একতলা বাড়ীর মত। পনের ফুট বাই বিশ ফুটের মত সাইজ। ভিনাইলের তৈরী, ঢালু ছাদ। ভেতরে রাজ্যের সব জিনিষপত্র রাখা – অধিকাংশই যন্ত্র পাতি, চার চাকার গ্রাস মোয়ার, কোদাল, কুড়াল থেকে শুরু করে কাঠ কাটার ইলেকট্রিক করাত... আরও কত কি! একবার কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকেছিল জুলেখা। এতো যন্ত্রপাতি এমন অগোছাল হয়ে আছে দেখে সে বেশ অবাকই হয়েছিল। মিজান এমনিতে খুব গোছান। একদিন সে সময় নিয়ে ভালো করে গুছিয়ে দেবে, ভাবল জুলেখা।

শেড টাকে পেছনে ফেলে আরেকটু এগিয়ে যেতে দেখল বিশাল এক পাইন গাছ শেকড় উপড়ে পড়ে আছে। গাছটা কম করে হলেও সত্তর-আশি ফুট লম্বা। হয়ত শেকড় দূর্বল ছিল, ঝড় ঝাপটায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। অনেক খানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে গাছটা। এই গাছ মিজানের পক্ষে একাকী সরানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। করাত দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে সরাতে হবে। বাসার ভেতরের ফায়ার প্লেসটা কাঠ ব্যবহার করে। মিজানের কাছেই শুনেছে, আজকাল এই ধরণের ফায়ার প্লেস খুব কমই আছে। তার বাড়ীটা কম করে হলেও চল্লিশ বছরের পুরানো। সে যখন কিনেছিল বছর বিশেক আগে তখন দাম অনেক কম ছিল। এখন কিনতে গেলে রাজার কোষাগার ফাঁকা

হয়ে যাবে। এদিকে নাকি সাংঘাতিক দাম বেড়েছে বাড়ীর। বাড়ী ঘর, টাকা–পয়সা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে চায় না জুলেখা, কিন্তু তারপরও মানুষটা যখন নিজ থেকে বলে তখন না শুনেও পারে না। মিজান এই এলাকার অনেক ইতিহাস বলে। সে যখন এই জায়গা কিনেছিল পানির দামে তখন আশে পাশে কেউ ছিল না। এখন তো চারদিকে মানুষ আর মানুষ। মাত্র আট দশ মিনিট ড্রাইভ করলেই দুনিয়ার যাবতীয় দোকান পাট। এজাক্স ছোট শহর কিন্তু কোন কিছুর অভাব নেই। তার বিশ্বাসই হয় না শহরের এতো কাছে এমন গ্রামীন জায়গা থাকতে পারে।

ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছটার পেছনে কিছুক্ষন সময় ব্যয় করল জুলেখা। মিজান হয়ত রাগ করবে কিন্তু তারপরও যেটুকু সে করতে পারে ততটুকু সে করবে। মিজানের কাজ একটু কমবে। এই গাছ নিশ্চয় এবারের শীতেই পড়েছে। বসন্ত এলে পরিষ্কার করবে বলে রেখে দিয়েছে।

ঘন্টা খানেকও হয়নি, বাসার মধ্যে ফোনটা বাজার শব্দ শুনতে পেল জুলেখা। নিশ্চয় লোকটা আবার অফিস থেকে ফোন করেছে। এতো ভয়ে ভয়ে থাকে। একটু পর পর ফোন করে জুলেখার গলা না শোনা পর্যন্ত তার ভয় কাটে না। একটা সেল ফোন ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে জুলেখা, বাসায় আরেকটা ল্যান্ড ফোন আছে। দুটোই পর পর বাজল। কোন টা না ধরায় একটার পর একটা বাজতেই থাকল। জুলেখা সেল ফোনটা সাথে আনতে ভুলে গেছে। সে দ্রুত পায়ে বাসায় ফিরে এসে দেখল ফোন ততক্ষনে থেমে গেছে। মিজানের সেলফোনে একটা ফোন দিল জুলেখা। ফোনে তাকে না পেলে মিজান ভয়ানক ভয় পেয়ে যায়। মিজান তড়িঘড়ি করে অফিস থেকে বেরিয়ে বাসার দিকে রওনা দিচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মনে হয় কথা বলতে চেয়েছিল। জুলেখার ইচ্ছা হল না। সে *ব্যাস্ত আছি* বলে ফোন রেখে দিল। বাসায় এলেই কথা যা বলার বলা যাবে।

সে ফোন রেখে আবার পেছনের মাঠে ফিরে গেল। এবার দক্ষিনে না গিয়ে উত্তরের জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। প্রায় শ' তিনেক ফুট ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটার পর জঙ্গল। নানা ধরণের নাম না জানা ঝোপ-ঝাড়, গাছ পালা, বসন্তের আগমনে গজিয়ে ওঠা নতুন পাতায় ঝলমল করছে। ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান জাতের চির সবুজ পাইন। শীতেও তাদের পাতা পড়ে না। কিন্তু বসন্তের প্রাণোচ্ছলতা যেন তাদেরকেও ছুঁয়ে গেছে। একটা পায়ে চলা চিকন পথ এঁকে বেঁকে বনের ভেতরে দিয়ে চলে গেছে। ঢোকার মুখটাতে বেশী প্যাঁচপ্যাঁচে। শাড়ী এক হাতে গোড়ালীর বেশ উপরে তুলে কাদা ভেঙ্গেই এগিয়ে গেল জুলেখা। পায়ের স্যান্ডেল কাদায় মাখামাখি হল, পায়েও বেশ লাগল। লাগুক। ধুয়ে ফেল্লেই হবে। ক'দিন ধরেই আসব আসব করেও শেষ পর্যন্ত আসা হয় নি। বনের ভেতর দিয়ে ভেজা মাটি আর আগাছার ভীড় পেরিয়ে একটু এগিয়ে যেতে পুকুরটা নজরে পড়ল। মিজান তাকে ইতিমধ্যেই বলেছে পুকুরটার কথা। এক শ' ফুট হবে লম্বায়, চওড়ায় হয়ত ফুট ষাটেক। দেখে মনে হয় না সেখানে কোন মাছ-টাছ আছে। শীতে নাকি পুরোটাই জমে বরফ হয়ে যায়। বসন্তে সেখানে ব্যাঙ, কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীরা এসে

জড় হয়। পুকুরটার পাশ ঘেঁষে আরেকটু এগিয়ে গেলে বায়ে পড়ে চিকন ঝর্ণাটা, একে বেঁকে চলে গেছে প্রায় ফুট বিশেক ঢালু টীলার শরীর বেয়ে। ঢালের পাশে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে তাকাতে কলকলিয়ে ছুটে যাওয়া জলের ধারা দেখল জুলেখা। বরফ এবং তুষার গলছে, সেই পানি বহন করে নিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটে গেছে অগভীর স্রোতস্বীনিটা। পানি প্রবাহের ক্রমাগত শব্দটা শুনতে ভালোই লাগছে। একবার ভাবল নীচে নেমে পানি পেরিয়ে জঙ্গলের ঐ পাশটা দিয়ে একটু হেঁটে আসবে। কিন্তু খেয়াল হল ঢালের মাটি ভেজা, কাদা কাদা হয়ে আছে। পিছলে পড়ে গেল শাড়ী টাড়ী সব নষ্ট হবে। ফোনটা আবার বাজছে। ধরল জুলেখা। মিজান। সে অফিস থেকে আজ একটু আগে বেরিয়ে পড়বে। কিছু আনতে হবে জুলেখার জন্য? কোথাও যেতে চায় জুলেখা? বাইরে খেতে চায়? মলে যেতে চায়? কি চায় সে? তার জন্য মিজান আকাশ পাতাল এবং সারা বিশ্ব এনে দিতে প্রস্তুত।

জুলেখা সেসব কিছুই চায় না। সে সংক্ষেপে সেটা জানিয়ে দিয়ে ফোন রেখে দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। রান্না করতে মন চাইছে। লোকটা বাংগালী খাবার খেতে পছন্দ করে। না হয় আজকে একটু রান্না করল। ফিরতি পথে দেখল ইয়াব্বড় একটা কালো কুচকুচে কাঠবেড়ালী। চারদিকে ছুটাছুটি করে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কি যেন খুঁজছিল। জুলেখাকে দেখেই একেবারে পাথর বনে গেল। হাঁ করে সেই যে তাকিয়ে আছে, চোখের পলকও ফেলছে বলে মনে হল না। জুলেখা ফিক করে হেসে ফেলল। "কি দেখছিস রে অমন হা করে?"

কাঠবেড়ালীটা মনে হল তার কথা বুঝতে পেরেছে। সে শরীরটাকে কেমন করে যেন একটু দোলাল, যেন বলতে চাইছে 'জানি না'। তারপর কথা নেই বার্তা নেই এক দৌড় দিয়ে একেবারে জুলেখার গায়ের উপর এসে পড়ল। জুলেখা ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু ধরা দিল না সে। আরেক লাফ দিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৌড় দিয়ে পালাল। জুলেখা তার নাম দিল 'পিচ্চী'। এমন কালো কুচকুচে কাঠবেড়ালী দেশে থাকতে সে কখন দেখেনি। এখানে আসা অবধি হ্যাংলা পাতলা কয়েকটাকে দেখেছে বনের মধ্যে ছোটাছুটি করে বেড়াতে। পিচ্চীকে প্রথম দেখল।

যতই সাবধানে চলাফেরা করুক, শাড়ীর তলটা ঠিকই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল। পা এবং জুতা কাদায় মাখামাখি। এভাবে সারাদিন কাটানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাসায় ফিরে একেবারে গোছল করবার সিদ্ধান্ত নিল। তার শুচিবায়ু আছে। আছে, আবার নেই। যখন নেই তখন সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, আবার যখন আছে তখন একটা ঝকঝকে জিনিষও ছুঁতে গেলে শরীর ঘিন ঘিন করে। যখন যেমন বোধ করে।